… ও উপযুক্ত নেতৃত্বদানে ব্যর্থতা হুমায়ুনের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

৫. শের শাহ

(ক) প্রথম জীবন : শের শাহের প্রকৃত নাম ফরিদ। সম্ভবত ১৪৮৬ খ্রি.-এ তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা সুরবংশীয় আফগান হাসান খান ছিলেন বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জাগীরদার। বিমাতার চক্রান্তে তিনি গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে জৌনপুরে যান। সেখানে এক প্রসিদ্ধ মাদ্রাসায় তিনি আরবি ভাষা, ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল পর পিতা তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে এনে তাঁর জাগীরের অন্তর্গত দুটি পরগনা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেন। তিন-চার বছর পর পারিবারিক চক্রান্তে আবার তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়। এরপর তিনি চুনারের সেনাধ্যক্ষ তাজ খান, গাজিপুরের মাক্‌তি নাসির খান নুহানী ও আগ্রার নায়েব দরিয়া খানের অধীনে কাজ করেন। ১৫২৪ খ্রি.-এ পিতা হাসান খানের মৃত্যুর পর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ফারমানের বলে তিনি পিতার জাগীর ও সম্পত্তির

পারিবারিক অশান্তি

Scanned by CamScanner

অধিকার লাভ করেন। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সঙ্গে পুনরায় বিরোধ দেখা দিলে ফরিদ বিহারের শাসনকর্তা দওলত খান নুহানীর পুত্র বাহার খানের সাহায্য চান। ইতিমধ্যে ১৫২৬ খ্রি.-এ পানিপথের যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ঘটলে বাহার খান সুলতান মুহম্মদ শাহ উপাধি নিয়ে স্বাধীন হয়ে যান। তাঁর ঘনিষ্ঠ বহু আফগান নেতার মতো ফরিদও সুলতানের দাক্ষিণ্য লাভ করেন। তাঁকে শের খান উপাধি দেওয়া হয় যদিও সমসাময়িক আফগান ঐতিহাসিকগণ এই নামের সঙ্গে ফরিদের 'শের' বা বাঘ মারার একটি কাহিনিকেও যুক্ত করেছেন। অতএব বাবর যখন দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন চল্লিশ বছর বয়সি শের খান তখন বিহার অঞ্চলে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিলেন।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পর ভাগ্য পরিবর্তন

শের খান নামে পরিচিতি

(খ) উত্থানের প্রেক্ষাপট : শের খান ও হুমায়ুনের দ্বন্দ্বকে সতীশ চন্দ্র শুধুমাত্র আফগান ও মোগল দ্বন্দ্ব বলে মনে করেন না। তাঁর মতে এই দ্বন্দ্বে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। *প্রথমত,* আফগান নুহানীগণ বিহারে এক স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ার চেষ্টা করেছিল একদিকে বাংলার সুলতান, অপরদিকে মোগলদের বিরোধিতা করে। তাদের পেছনে পূর্ব উত্তরপ্রদেশের প্রভাবশালী সারওয়ানী ও ফরমুলী পরিবারের সমর্থন ছিল যারা পূর্বতন জৌনপুর রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখত। পানিপথের যুদ্ধের স্বল্পকাল পরেই সুলতান মুহম্মদ শাহের মৃত্যু হলে নুহানী আফগান রাজত্বের অবসান হয়। কিন্তু এই স্বপ্ন জাগরুক রাখার দায়িত্ব বর্তায় শের খানের ওপর।

নুহানী আফগানদের পতনের পর জৌনপুর রাজ্যের স্বপ্ন জাগরুক রাখার দায়িত্ব শের খানের ওপর বর্তায়

দ্বিতীয়ত, ইক্তা বা জাগীর হস্তান্তর ও বিভাজন নিয়ে প্রভাবশালী আফগান পরিবারগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলত। এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বাবর বায়াজিদ ফরমুলী, মাহমুদ নুহানী, ফৎখান সারওয়ানীর মতো আফগান অভিজাতদের মোগলপক্ষে নিয়ে আসেন। শের খানও পারিবারিক কলহে পৈতৃক জাগীর থেকে বিতাড়িত হয়ে জৌনপুরের মোগল শাসনকর্তার সাহায্যে কয়েকটি অতিরিক্ত পরগনাসহ পুরানো জাগীর ফিরে পান। মোগলরা যখন রানা সঙ্গের দিক থেকে ও পরবর্তীকালে বাহাদুর শাহের দিক থেকে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছিল তখন অনেক আফগান নেতা মোগলপক্ষ ত্যাগ করে মোগল বিরোধী সুলতান মুহম্মদ ও পরে সুলতান মাহমুদ লোদীর পক্ষে যোগ দেয়। শের খান ছিলেন এদের অন্যতম।

বহু আফগান নেতার প্রথমে মোগলদের পক্ষে ও পরে মোগলবিরোধী পক্ষে যোগদান

তৃতীয়ত, শের খান একাধিক অভিজাত মহিলার আনুকূল্য লাভ করেন, আফগান সমাজে যাঁরা ছিলেন সম্মানীয়। চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খানের বিধবাপত্নী লাদ মালিকা ও গাজিপুরের শাসক নাসির খান নুহানীর সন্তানহীনা বিধবাপত্নী গওহর গোসাই তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ধনসম্পদ রক্ষার স্বার্থে শের খানকে বিবাহ করেন। এর ফলে শের খান প্রচুর পরিমাণ সোনা ও মূল্যবান ধনরত্ন লাভ করেন। বিহারের শাসক মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবাপত্নী দুদু নাবালক পুত্র জালালের অভিভাবক হিসাবে শের খানকে নিযুক্ত করলে বিহার অঞ্চলে তাঁর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। মিঁয়া মহম্মদ ফরমুলীর কন্যা বিবি ফৎ মালিকার অসহায়তার সুযোগে শের খান তাঁর প্রচুর সোনা আত্মসাৎ করেন।

অভিজাত মহিলাবর্গের আনুকূল্য লাভ

সতীশ চন্দ্রের মতে, মোগলদের অন্যত্র ব্যস্ততার জন্য পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের রাজনীতিতে শূন্যতা, ওই অঞ্চলের বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, বিহার ও বাংলার মধ্যে ধারাবাহিক সংঘাত নিঃসন্দেহে শের খানের উত্থানের সহায়ক হয়েছে।

এক বিশেষ মুহূর্তে শের খানের কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না

Scanned by CamScanner

জালাল খানের অভিভাবক হিসাবে তিনি বিহারের প্রশাসনে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হ
প্রচুর পরিমাণ অর্থের সাহায্যে তিনি এক দক্ষ সেনাবাহিনী সংগঠিত করার সুযোগ পা
ফলে এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাঁর কোনো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল না।

(গ) বিহার বিজয় : পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধের পর বাবর যখন উত্তর ভারত
তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন, শের খান তখন মোগল বাহিনীতে যোগ দেন। বাবরে
পশ্চিম ভারতে চান্দেরী ও পূর্ব ভারতে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শের খান তাঁকে সাহা
করেন। এর পুরস্কার স্বরূপ বাবরের সহায়তায় তিনি সাসারামে তাঁর পৈতৃক জা
ফিরে পান। ১৫২৮ খ্রি.-এ তিনি পুনরায় বাহার খান বা মুহম্মদ শাহের অধীনে চাক
নেন। মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর নাবালক পুত্র জালাল খানের অভিভাব
নিযুক্ত হয়ে সব ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। ১৫৩০ খ্রি.-এ তিনি চুনার দুর্গের অধিপতি তা
খানের বিধবাপত্নী লাদ মালিকাকে বিবাহ করে দুর্গের অধিকার লাভ করেন। গাজিপুরে
শাসক নাসির খান নুহানীর বিধবাপত্নী গওহর গোসাইকেও তিনি বিবাহ করেন। এ
দুই বিবাহের ফলে শের খান প্রচুর পরিমাণ ধনসম্পদ লাভ করেন। শের খানের শক্তি
বৃদ্ধিতে জালাল খানসহ বিহারের নুহানী নেতাগণ আশঙ্কিত হন। বাংলার সুলতা
গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে একযোগে তারা শের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ১৫৩
খ্রি.-এ এই সম্মিলিত বাহিনীকে শের খান কিউল নদীর তীরে সুরজগড়ের যুদ্ধে
শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। চুনার থেকে সুরজগড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাঁর অধিকা
আসে। বাংলাদেশ আক্রমণের পথ সুগম হয়। এই যুদ্ধ এক অখ্যাত জাগীরদারের পু
শের খানকে বিহারের অবিসম্বাদিত নেতার মর্যাদার উন্নীত করে।

বাবরের সহায়তা লাভ

জালাল খানের অভিভাবক

চুনার দুর্গ অধিকার

সুরজগড়ের যুদ্ধ, ১৫৩৪
বিহারের নুহানী আফগান ও বাংলার সুলতানের পরাজয়

(ঘ) শের খান ও হুমায়ুন : ১৫৩৫ খ্রি.-এ শের খান বাংলা আক্রমণ করলে সুলতা
গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও কিউল থেকে সকরিগলি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চ
তাঁকে প্রদান করেন। কিন্তু সুলতান মাহমুদ পোর্তুগিজদের সাহায্য নিয়ে শের খানে
মোকাবিলা করতে চাইলে ১৫৩৭ খ্রি.-এ আফগানবাহিনী পুনরায় গৌড় আক্রমণ কর
অধিকার করে নেয়। ১৫৩৮ খ্রি.-এর গোড়ায় হুমায়ুন প্রথমে চুনার দুর্গ অধিকার কর
বাংলার উদ্দেশে অগ্রসর হলে শের খান প্রকাশ্য সংঘাত এড়িয়ে উত্তর ভারতের দিকে
অগ্রসর হন। হুমায়ুন বাংলা দখল করে নেন। শের খান চুনার পুনরুদ্ধার করে উত্ত
ভারতের রোহ্‌তাস, বারাণসী, জৌনপুর, কনৌজ প্রভৃতি স্থান দখল করে নিলে হুমায়ুনে
আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ১৫৩৯খ্রি.-এ বর্তমান বিহার ও উত্তরপ্রদেশের
সীমানায় বক্সারের কাছে চৌসার যুদ্ধে আফগানবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে হুমায়ুন পরাস্ত
হন। জৌনপুর, বিহার ও বাংলায় শের খানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শের শাহ
উপাধি গ্রহণ করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রি.-এ কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে
আফগান ও মোগলবাহিনী পুনরায় পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাস্ত
হন ও ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হন। মোগল সাম্রাজ্যের সাময়িক পতন ঘটে, পূর্ব
ও উত্তর ভারতে পুনরায় আফগান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

শের শাহের বাংলা অধিকার, ১৫৩৭

চৌসার যুদ্ধ, ১৫৩৯

বিলগ্রামের যুদ্ধ, ১৫৪০

(ঙ) উত্তর ও পশ্চিম ভারত বিজয় : হুমায়ুনের পলায়নের পর শের শাহ উত্তর
ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। কামরান তাঁকে পাঞ্জাব ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।
মোগলদের ওপর নজর রাখার জন্য শের শাহ সেখানে রোহ্‌তাস নামে এক দুর্গ নির্মাণ
করেন। পঞ্চাশ হাজার সেনা সেখানে মোতায়েন করা হয়। সিন্ধু ও মুলতানও অধিকৃত
হয়। ইতিমধ্যে গৌড়ে খিজির খান বিদ্রোহ করলে তা দমন করা হয়। বাংলায় বিদ্রোহের
সম্ভাবনা নির্মূল করার লক্ষ্যে তার সীমানা সংকুচিত করে তাকে উনিশটি সরকারে বিভক্ত

পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মুলতান জয়

বাংলার বিদ্রোহ দমন

Scanned by CamScanner

করা হয়। সরকারগুলির কাজে সমন্বয়সাধনের জন্য আমিন-ই-বাংলা পদের এক আধিকারিক নিযুক্ত হন। মধ্যভারতে দু-বছর অবরোধের পর গোয়ালিয়র অধিকার করা হয়। ১৫৪২ খ্রি.-এ মালব শের শাহের বশ্যতাস্বীকার করলেও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রায়সিন দুর্গের অধিপতি পুরণ মল প্রতিরোধ চালিয়ে যান। শেষপর্যন্ত তিনি সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হলে দুর্গটি আফগান সেনার হস্তগত হয়। কিন্তু রাজস্থানের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। মারওয়াররাজ মালদেও হুমায়ুন ও শের শাহের দ্বন্দ্বের সুযোগে পশ্চিম ও উত্তর রাজস্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি আজমীড় ও মেবার জয় করেন। মালদেওর বিকানীর অভিযানের সময় সেখানকার রাজার মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রদ্বয় শের শাহের সাহায্য ভিক্ষা করেন। রাজস্থানে মালদেওর ক্ষমতাবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে দিল্লি-আগ্রার শাসকের পক্ষে শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৫৪৪ খ্রি.-এ আজমীড় ও যোধপুরের মধ্যবর্তী স্থান সামলেতে রাজপুত ও আফগানবাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। শের শাহ সুকৌশলে শঠতার আশ্রয় নিয়ে রাজপুত সর্দারদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করেন। কিছু রাজপুত নেতা যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও মালদেও যোধপুর ত্যাগ করে সিওয়ানায় আশ্রয় নেন। আফগান গোলন্দাজ বাহিনীর সামনে রাজপুত সেনাদের প্রবল প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। শের শাহ এরপর মেবার আক্রমণে গেলে মেবাররাজ বিনা প্রতিরোধে চিতোর তাঁর হাতে তুলে দেন। মাত্র দশ মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে শের শাহ প্রায় সম্পূর্ণ রাজস্থান অধিকার করে নেন। তবে রাজস্থানকে প্রত্যক্ষভাবে আফগান সাম্রাজ্যভুক্ত না করে তিনি আজমীড়, যোধপুর, আবু পাহাড়, চিতোর প্রভৃতি স্থানে সেনা শিবির স্থাপন করেন। শের শাহের শেষ অভিযান ছিল ১৫৪৫ খ্রি.-এ বুন্দেলখণ্ডের দুর্ভেদ্য দুর্গ কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে। দুর্গটি অধিকৃত হলেও এক বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনায় শের শাহের মৃত্যু হয়।

গোয়ালিয়র ও মালব জয়

রাজস্থান

সামেলের যুদ্ধ, ১৫৪৪

রাজস্থান শের শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়নি

মৃত্যু, ১৫৪৫

(চ) শের শাহের উত্তরাধিকারীগণ : শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আদিল খানকে আফগান অভিজাতবর্গ সিংহাসনে আরোহণের উপযুক্ত বলে মনে করেননি। তাঁর স্থলে অপর পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আসীন হন। খওয়াস খান ও হাইবৎ নিয়াজীর মতো অভিজাত এবং খক্কর উপজাতির বিদ্রোহ তিনি দমন করেন। নয় বছর রাজত্বের পর ১৫৫৪ খ্রি.-এ তাঁর মৃত্যু হয়। ইসলাম খানের নাবালক পুত্র ফিরুজ এরপর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শের খানের ভ্রাতা নিজাম খান সুরের পুত্র মুবারিজ খান ফিরুজকে হত্যা করে মহম্মদ আদিল শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুর বংশীয় অন্যান্য অভিজাতবর্গ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। এদের মধ্যে ছিলেন ইব্রাহিম খান সুর, আহমেদ খান সুর ও মহম্মদ খান সুর। আহমেদ খান সিকন্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। আফগানদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রি.-এ সিকন্দর শাহকে পরাস্ত করে দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে নেন। ইতিমধ্যে আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু ইব্রাহিম ও মহম্মদ খান সুরকে পরাস্ত করেন। অতএব উত্তর ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হন—হুমায়ুন ও আদিল শাহ। ১৫৫৬ খ্রি.-এ হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আফগান শক্তিকে দমন করার দায়িত্ব বর্তায় পুত্র আকবর ও তাঁর অভিভাবক বৈরাম খানের ওপর।

ইসলাম শাহ

ফিরুজ

মহম্মদ আদিল শাহ

সিকন্দর শাহ

হুমায়ুনের প্রত্যাবর্তন

(ছ) শাসনব্যবস্থা : ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় পানিপথের যুদ্ধের পর মোগল-আফগান ও মোগল-রাজপুত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তর ভারতে এক রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। আঞ্চলিক রাজ্যগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, আফগান ও রাজপুত রাজন্যবর্গ নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলছিল। এই অস্থিরতার সুযোগে প্রায় এক

রাজনৈতিক অস্থিরতা
দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্য

Scanned by CamScanner

আফগান স্বাতন্ত্র্যবোধ ও তুর্কী কেন্দ্রীকরণের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান

দশকের প্রচেষ্টার পর নিজ বিচক্ষণতার বলে শের শাহ পূর্ব ও উত্তর ভারতব্যাপী দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এই সাম্রাজ্যকে শাসন করার জন্য তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা ছিল আফগান স্বাতন্ত্র্যবোধ ও তুর্কি কেন্দ্রীকরণের মধ্যে এক ধরনের সামঞ্জস্যবিধান। রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন, শের শাহ মনে হয় আফগান ও তুর্কি সার্বভৌম তত্ত্বের মধ্যে মীমাংসা ঘটাতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন সুলতানের হাতে, যার ভিত্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব, অধ্যাবসায়, সেনাবল ও শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ।

নরপতিত্বের আদর্শ দুটি উপলব্ধি

স্বল্পকালের শাসনে শের শাহের দুটি উপলব্ধি হয়েছিল। *প্রথমত*, প্রজাবর্গের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অ-মুসলমান ও অ-আফগান; *দ্বিতীয়ত*, তিনি জানতেন সমগ্র সুলতানি যুগে দুটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী অনেক সময়েই সুলতানের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল—একটি অভিজাতবর্গ, অপরটি উলেমাগোষ্ঠী। সেই কারণে তাঁর নরপতিত্বের আদর্শ সিংহাসনের সার্বভৌম ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। প্রশাসনের উচ্চপদে আফগান অভিজাতদের প্রাধান্য থাকলেও তিনি তাদের সুলতানের সমকক্ষতার দাবি থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেন। পূর্বসূরি দিল্লির সুলতানদের পথে না গিয়ে শের শাহ খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনেও বিরত থাকেন। পরিবর্তে তিনি 'সুলতান-ই-আদিল', 'আল-আমির আল গাজী', 'খুদ আল্লাহ্ খিলাফতু' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে খলিফার সমমর্যাদা সম্পন্ন বলে দাবি করেন। এর ফলে মুসলমান প্রজাদের চোখে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এর দ্বারা তিনি এক নতুন নরপতিত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন যা ছিল অভিজাত ও উলেমাপ্রভাব মুক্ত।

সিংহাসনের সার্বভৌমত্ব

আফগান অভিজাতগণ সুলতানের সমকক্ষ নন

সুলতান খলিফার সমমর্যাদাসম্পন্ন

শাসনব্যবস্থার ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য শের শাহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিভিন্ন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যে অরাজকতা দূর করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর হাতে দস্যু এবং বিদ্রোহী অভিজাত ও জমিদারদের দমন করেন। ব্যাবসাবাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহায়ক হয়। তাঁর শাসনকালে চারটি দীর্ঘ রাজপথ নির্মিত হয়েছিল। প্রথমটি ছিল বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত; দ্বিতীয়টি আগ্রা থেকে যোধপুর ও চিতোর পর্যন্ত; তৃতীয়টি লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত ও চতুর্থটি ছিল আগ্রা থেকে বুরহানপুর পর্যন্ত যার সঙ্গে গুজরাতের সমুদ্রবন্দরগামী পথগুলি যুক্ত ছিল। যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য রাজপথগুলির দুধারে আট কিলোমিটার অন্তর সরাইখানা স্থাপন করা হয়। কালিকারঞ্জন কানুনগো সরাইখানাগুলিকে 'সাম্রাজ্যের ধমনী' আখ্যা দিয়েছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ছাড়াও সরাইখানাগুলি ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসারেরও সহায়ক হয়েছিল। অনেক সরাইখানা কালক্রমে গঞ্জ হিসাবে গড়ে ওঠে। সংবাদ বহনের কেন্দ্র বা ডাকচৌকি হিসাবেও এগুলি ব্যবহার করা হত। এগুলির মাধ্যমে সুলতান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করতে পারতেন। অশ্বারোহী সংবাদবাহকেরা এখানে ঘোড়া বদল করত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ১৭০০টি সরাইখানা স্থাপিত হয়। দারোগা-ই-সরাইখানা ও দারোগা-ই-ডাকচৌকি এগুলির তদারকি করত।

দস্যু দমন

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

চারটি রাজপথ

সরাইখানা

ডাকচৌকি—সংবাদ প্রেরণ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শের শাহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অবাধ বাণিজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। বিশাল সাম্রাজ্যের মাত্র দুটি স্থানে শুল্ক আদায় করা হত। বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ও বহিরাগত দ্রব্যের ওপর শুল্ক আদায় করা হত

বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের কেন্দ্রীকরণ

Scanned by CamScanner

সকরিগলিতে; খুরাসানসহ মধ্য এশিয়া ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে আমদানি করা দ্রব্যের ওপর শুল্ক আদায় করা হত সিন্ধুতে। পথে, ফেরিঘাটে বা কোনো শহরে শুল্ক আদায় করা যেত না। দ্রব্যসামগ্রী বিক্রির সময় তাদের দ্বিতীয়বার শুল্ক প্রদান করতে হত। সাম্রাজ্যের সর্বত্র কঠোরভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়ায় বণিকরা নিরাপদ বোধ করত। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করে শের শাহ উন্নত ও সমমানের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা প্রচলন করেন। সর্বত্র একই ধরনের ওজন ও পরিমাপের একক প্রচলনের চেষ্টাও করা হয়। এর ফলে শুধু ব্যাবসা-বাণিজ্যেরই উন্নতি হয়নি, এই ব্যবস্থাগুলি সাম্রাজ্যের সংহতির পক্ষেও সহায়ক হয়েছিল। কারণ সব ব্যবস্থারই উৎস ছিল সুলতান ও কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী।

দুটি স্থানে শুল্ক আদায় সকরিগলি ও সিন্ধু

মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার

একই ধরনের ওজন ও পরিমাপ

শের শাহ প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, সামরিক সংস্কার ও বিচারব্যবস্থা সুলতানকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করেছিল। অভিজাত সামন্তশ্রেণির বাইরে সমাজের অন্যান্য অংশের জনসাধারণের সঙ্গে সুলতানের যোগাযোগ স্থাপনের এগুলিই ছিল প্রধান মাধ্যম। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের দায়িত্ব তিনি মুকদ্দম বা গ্রামপ্রধান ও জমিদারদের হাতে না দিয়ে কৃষকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন বলে মনে করা হয়। জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের রীতি ভারতে প্রচলিত থাকলেও শের শাহের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। জমিকে ভালো, মন্দ ও মাঝারি, এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করে তার গড় উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ সরকারের প্রাপ্য হিসাবে ধরা হত। শের শাহ অর্থমূল্যে রাজস্ব প্রদান পছন্দ করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শস্যেও রাজস্ব দেওয়া যেত। বিশেষ পরিস্থিতির কারণে মুলতানকে এই জরিপের বাইরে রাখা হয়। সেখানে রাজস্ব দাবি ছিল এক-চতুর্থাংশ। জমি জরিপ প্রতিবছর করা হত। দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্য মজুত করার উদ্দেশ্যে বিঘা প্রতি আড়াইসের শস্য অতিরিক্ত রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত। শের শাহের ভূমিরাজস্ব সংস্কারের ব্যাপ্তি কি ছিল ও সত্যিই প্রকৃত কৃষকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হত কিনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে। ইরফান হাবিবের গবেষণায় দেখা গেছে এমনকি আকবরের জমি জরিপ ব্যবস্থাও দোয়াব, পাঞ্জাব ও মালব অঞ্চলের বাইরে পৌছয়নি। আবার একটি প্রদেশের সর্বত্রও তা প্রসারিত হয়নি। শের শাহের সময় প্রত্যেক কৃষককে তার দেয় রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখ করে 'পাট্টা' নামে একটি দলিল দেওয়া হত। দলিলে উল্লেখিত পরিমাণের অতিরিক্ত কিছু আদায় করা যেত না। কেউ কেউ শের শাহের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ আমলের রায়তওয়ারী ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেখানে ব্রিটিশ সরকার রায়তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করত। সতীশ চন্দ্র দেখিয়েছেন জমি জরিপ ও রাজস্ব নির্ধারণের কাজে মুকদ্দম ও জমিদাররাও যুক্ত থাকত। বস্তুত মধ্যযুগের রাষ্ট্রের পক্ষে এই দুই শ্রেণিকে এড়িয়ে কিছু করা সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্র বড়োজোর এদের নিয়ন্ত্রণে রাখত।

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

কৃষকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ

ভালো-মন্দ-মাঝারি, তিন শ্রেণির জমির গড় উৎপাদনের $^{১}/_{৩}$ অংশ রাজস্ব

দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্য মজুত

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ব্যাপ্তি

ব্রিটিশ রায়তওয়ারী ব্যবস্থার সঙ্গে মিল থাকলেও মুকদ্দম ও জমিদাররাও যুক্ত ছিল

সেনাবাহিনীর দুর্নীতি দূর করে এবং সুলতানের নিজস্ব স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী সংগঠিত করে শের শাহ সামন্তবাহিনীর ওপর নির্ভরতাকে হ্রাস করেছিলেন। সেনাবাহিনীতে 'দাঘ' অর্থাৎ অশ্বের চিহ্নিতকরণ এবং 'চেহ্‌রা' অর্থাৎ সেনাদের বিবরণাত্মক দলিল রাখার পুরানো রীতি তিনি পুনঃপ্রবর্তন করেন। দেড় লক্ষ অশ্বারোহী, পঁচিশ হাজার তীরন্দাজসহ পদাতিক, পাঁচ হাজার হাতি ও সুশিক্ষিত গোলন্দাজবাহিনী নিয়ে শের শাহের সেনাবাহিনী গঠিত ছিল। এ ছাড়া কুড়ি, দশ ও পাঁচ হাজার সওয়ারের অভিজাত সেনাধ্যক্ষও ছিল। সেনাধ্যক্ষগণ সম্ভবত উপজাতীয় ভিত্তিতে সেনা নিযুক্ত করত। সেনাধ্যক্ষ ও সৈনিক উভয়েই সম্ভবত বেতনের পরিবর্তে ইক্তা লাভ করত।

সামরিক সংস্কার 'দাঘ' ও 'চেহ্‌রা'

বিশাল সেনাবাহিনী

অভিজাত সেনাধ্যক্ষ

Scanned by CamScanner

বিচারব্যবস্থা

পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার

রূপায়ণ নিয়ে সন্দেহ

কাজিদের নিযুক্তি

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা

শের শাহ ন্যায়বিচারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এর মাধ্যমেই তিনি সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। উদার ধর্মনীতি অনুসরণ করে এবং জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য পক্ষপাতহীন বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্যকে এক জাতীয় সাম্রাজ্যে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তিনি বিধর্মী ও মুসলমানের মধ্যে কোনো বিভেদ করতে নিষেধ করেন। শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে তিনি নিজের উপজাতি ও আত্মীয়বর্গের সঙ্গে অপরের কোনো পার্থক্য করতেন না। তবে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি কতটা রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছিল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র কাজিদের নিযুক্ত করা হয়। তারা বিচারকার্য সম্পাদন করত। পঞ্চায়েত ও বর্ণসংগঠনগুলি হিন্দুদের দেওয়ানি মামলা এবং জমিদার ও শিকদারগণ ফৌজদারি মামলার বিচারের দায়িত্বে ছিল।

প্রশাসনিক বিভাজন

গ্রাম-পরগনা-শিক বা সরকার

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে শের শাহ যথেষ্ট বাস্তববোধের পরিচয় দেন। পূর্বের রীতি বজায় রেখে প্রশাসনের নিম্নতম একক ছিল 'গ্রাম'। মুকদ্দম বা গ্রামপ্রধান গ্রামের আইন-শৃঙখলা রক্ষার দায়িত্বে ছিল, হিসাবপত্র দেখাশোনা করত পাটোয়ারী। কতকগুলি গ্রামকে নিয়ে গঠিত হত 'পরগনা'। পরগনার সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা দেখাশোনা করত 'শিকদার'। জমি জরিপ ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করত 'মুনসিফ' ও 'আমলা'। 'খাজানদার' ও 'পোদ্দার' আদায়ীকৃত নগদ অর্থ জমা রাখত। দুর্নীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে এদের দুবছর অন্তর অন্যত্র বদলি করা হত। পরগনার ওপর ছিল 'শিক' যদিও লোদী শাসনের সময় 'সরকার' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হত। সরকারের নেতৃত্বে 'শিকদার-ই-শিকদারান' নামে কোনো আমলা ছিলেন বলে বলা হলেও সতীশ চন্দ্র দেখিয়েছেন এই নামের উল্লেখ কোথাও নেই। সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি 'ফৌজদার' বা 'মাক্‌তা' নামেই পরিচিত ছিল। তাকে সাহায্য করত 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান' যার কর্তব্য ছিল ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও পরগনাগুলির মধ্যে বিরোধ মেটানো। ভূমিরাজস্ব আদায়ও তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ত ও এরজন্য প্রয়োজনে তারা সামরিক অভিযানও চালাত।

সরকার ও প্রদেশ নিয়ে বিতর্ক

প্রদেশ মোগল শাসনকালে সৃষ্ট

কালিকারঞ্জন কানুনগোর মতে সরকারের চেয়ে বড়ো কোনো বিভাগ শের শাহের সময় ছিল না, প্রদেশগুলি আকবরের সৃষ্টি। অপরদিকে পরমাত্মা সরণ মনে করেন আকবরের অনেক আগেই শের শাহ সামরিক শাসিত প্রদেশ গঠন করেছিলেন। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে সুলতানি আমলে প্রাদেশিক শাসন বলে সেরকম কিছু ছিল না। বেশ কয়েকটি 'শিক' একত্রে বলা হত 'খিত্তা' বা 'ভিলায়েত'। বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং কিছু উপদ্রুত অঞ্চলে এর অস্তিত্ব ছিল। শের শাহ এই সুলতানি রীতিই মেনে চলেন। লাহোর, মুলতান, যোধপুর। রণথম্বোর ও নগরকোটের পার্বত্য অঞ্চলে শিক বা সরকারগুলিকে একত্রে এক এক জন আমিন বা মাক্‌তার মতো সামরিক নেতার অধীনে ন্যস্ত করা হত। সতীশ চন্দ্র মনে করেন প্রশাসনিক একক হিসাবে প্রাদেশিক সরকারগুলি মোগল শাসনকালেই গড়ে ওঠে। শের শাহ শুধু শিক বা সরকারগুলির সীমানা ও কাঠামো সংগঠিত ও স্থিতিশীল করে তোলেন।

কেন্দ্রীভূত প্রশাসন

শের শাহের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো কী ছিল তা স্পষ্ট জানা যায় না। তবে মোগলদের মতো মন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না করে যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেন। রাজস্ব ও সেনাবিভাগসহ অন্যান্য পুরানো বিভাগগুলির অস্তিত্ব থাকলেও বিভাগীয় প্রধানগণ সামান্য ক্ষমতাই ভোগ করত।

Scanned by CamScanner

সুলতানি যুগের কেন্দ্রীভূত প্রশাসন শের শাহের সময়ে অপরিবর্তিত

আদি তুর্কি সুলতানদের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল একটি কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক সংগঠন, যার কেন্দ্রে ছিলেন অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী এক নৃপতি। শের শাহ তাঁর পূর্বসূরিদের এই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোই অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করেন। মন্ত্রীদের হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। অক্লান্ত পরিশ্রম করে শাসনব্যবস্থার খুঁটি-নাটি সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকতেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপকভাবে সফর করে তিনি জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

কেন্দ্রীকরণের দুর্বলতা

কেন্দ্রীকরণের এই অত্যধিক প্রবণতাকে সতীশ চন্দ্র 'ক্ষতিকর' আখ্যা দিয়েছেন। কারণ শের শাহের মতো এক দক্ষ শাসকের অনুপস্থিতিতে সাম্রাজ্যের ওপর এর অশুভ প্রভাব পড়েছিল। রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী শের শাহের ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ঝোঁককে 'স্বেচ্ছাতন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে উপযুক্ত কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র গড়ে না তুলে ক্ষমতার এই ধরনের কেন্দ্রীকরণ সাম্রাজ্যের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। শের শাহের শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক প্রবল হলেও, শাসনব্যবস্থার বাইরে তিনি এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যা তাঁর সাম্রাজ্যকে স্থাপন করেছিল আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু না হলে এবং তাঁর গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আরও সম্প্রসারিত হলে উত্তর ভারতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র গড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল না।

প্রশাসন আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে

শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের সম্ভাবনা

(জ) মূল্যায়ন : শের শাহ তাঁর দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন এমন এক সময়ে যখন ভারতবর্ষে আঞ্চলিক রাজ্যগুলি প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং আফগান ও রাজপুত রাজন্যবর্গ নিজ নিজ অঞ্চলে প্রাধান্য বজায় রেখে চলছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পর মোগল-আফগান ও মোগল-রাজপুত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তর ভারতে এক রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই অস্থিরতার সুযোগে প্রায় এক দশকের প্রচেষ্টার পর নিজ বাহু ও বুদ্ধি বলে শের শাহ সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। একজন সফল সেনাপতি ও প্রশাসক হওয়ার পাশাপাশি তাঁর চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলিও আপন দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল।

রাজনৈতিক অস্থিরতা শের শাহের উত্থানের সহায়ক

সামরিক প্রতিভার পাশাপাশি শের শাহের সংস্কৃতি মনস্কতারও পরিচয় পাওয়া যায়। আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। 'সিকন্দরনামা', 'গুলিস্তান' প্রভৃতি সাহিত্যগ্রন্থের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর সময়ে পূর্ব উত্তরপ্রদেশের মালিক মহম্মদ জইস হিন্দি ভাষায় পদ্মাবৎ নামে এক কাব্য রচনা করেন। ইসলামীয় ধর্মযাজক ও ধর্মীয় জগতের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সংক্ষিপ্ত শাসনকালের মধ্যেই তিনি এক অভিনব স্থাপত্যরীতির প্রবর্তন করেন। দিল্লির পুরানা কিল্লার অভ্যন্তরে কিলা-ই-কুহ্না মসজিদ উচ্চমানের স্থাপত্যরুচির পরিচয় বহন করে। শিল্প সমালোচক পার্সি ব্রাউন এই মসজিদটিকে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত বহু কীর্তির উৎস বলে মনে করেছেন। সাসারামে দ্বীপের মধ্যে নির্মিত শের শাহের নিজের সমাধি মন্দিরটি অনন্যসাধারণ সৌন্দর্যপ্রভায় মণ্ডিত।

সংস্কৃতিমনস্কতা

সাহিত্য

স্থাপত্য

ব্যক্তিগত জীবনে শের শাহ নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান হলেও সাধারণ প্রশাসনে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। তাঁর প্রশাসনও ছিল উলেমাপ্রভাবমুক্ত। দিল্লির সুলতানদের মতো তিনি খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেননি। তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রায় তাঁর যে উপাধি উৎকীর্ণ করা হয় তাতে তিনি খলিফার সমান মর্যাদা দাবি করেন। চান্দেরি দুর্গ অধিকারের সময় পুরণ মলের পরিবারের নৃশংস হত্যার পেছনে ধর্মীয় প্রতিহিংসার চেয়েও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বেশি ছিল বলে মনে করা হয়। শের শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় যে

উলেমা ও খলিফা প্রভাবমুক্ত প্রশাসন

Scanned by CamScanner

জিজিয়া করের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক

তিনি জিজিয়া কর উচ্ছেদ করেননি ও সরকারি প্রশাসনে আফগানদেরই প্রাধান্য বজায় রাখেন। জিজিয়া করের প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ আছে। খালিক আহমেদ নিজামী এটিকে অকৃষিকর আখ্যা দিলেও সতীশ চন্দ্র মনে করেন গ্রামাঞ্চলের হিন্দুদের ওপর থেকে ভূমিরাজস্বের অঙ্গ হিসাবে এটি আদায় করা হত। হিন্দুদের প্রতি শের শাহের সামগ্রিক নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জিজিয়া কর কখনই হিন্দুবিদ্বেষী কোনো বৈষম্যমূলক কর ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে মন্দির ধ্বংসের উল্লেখ সমসাময়িক রচনায় পাওয়া যায় না। বরং উল্লেখ আছে তিনি মুসলমান ও বিদেশি বিদগ্ধজনের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ, মন্দির ও মঠকেও নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। অপরদিকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে আফগান সর্দারদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে তিনি তাদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগের বিভিন্ন পদ হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

ব্রাহ্মণ, মন্দির ও মঠকে নিষ্কর জমি দান

উচ্চপদে হিন্দুদের নিযুক্তি

শের শাহের প্রজাহিতৈষণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পদস্থ আমলাদের বিভিন্ন শহরে অবস্থানকারী অক্ষম ও প্রতিবন্ধী মানুষের তালিকা প্রস্তুতের নির্দেশ দান। তারা সরকারের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান লাভ করত। গরিব মানুষের জন্য সরকারি আনুকূল্যে লঙ্গরখানা খোলা হয়। অধীনস্থ অনেক অভিজাত এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে।

অক্ষম মানুষের তালিকা

প্রশাসক হিসাবে শেরশাহের কৃতিত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। দীর্ঘদিন পূর্বে উইলিয়াম আর্সকিন মন্তব্য করেছিলেন, শেরশাহের মধ্যে একজন সফল সামরিক নেতার চেয়েও এক আইনপ্রণেতা ও জনগণের অভিভাবকের মানসিকতা ছিল বেশি। কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁর মধ্যে আকবরের চেয়েও উন্নতমানের সৃজনশীল প্রতিভা ও জাতি সংগঠককে খুঁজে পেয়েছেন। শের শাহ সম্পর্কে এই অভিমতের বিরুদ্ধে রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী ও পরমাত্মা সরণ তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা মনে করেন প্রশাসক হিসাবে শের শাহের কৃতিত্বকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন মূলত একজন সংস্কারক, উদ্ভাবক নয়। তাঁর সার্বিক কৃতিত্বকে খাটো না করেও বলা হয়েছে তিনি কোনো নতুন চিন্তার বা কোনো সুউচ্চ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন না। তিনি যেন একজন পরিশ্রমী, কিন্তু মন্থর রাষ্ট্রপরিচালক। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী ও কর্মকুশল ব্যক্তি।

কৃতিত্ব নিয়ে বিতর্ক

আর্সকিন ও কানুনগো বনাম ত্রিপাঠী ও সরণ—সংস্কারক, উদ্ভাবক নন

পরিশ্রমী কিন্তু মন্থর রাষ্ট্র পরিচালক

শের শাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোনো নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি না করে, তিনি পুরানো শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নতুন উদ্যমে প্রাণ সঞ্চার করেন। এই কাজে তিনি এত সাফল্য অর্জন করেন যে শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে। তিনি কোনো নতুন মন্ত্রক সৃষ্টি করেননি; প্রশাসনিক বিভাজন ও উপবিভাজনগুলি অতীত থেকে নেওয়া; আমলাদের পদের নামগুলিও পুরানো; তাঁর সামরিক সংস্কার আলাউদ্দিন খলজীর অনুকরণ; তাঁর ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও জমি জরিপ পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজী, মহম্মদ বিন তুঘলক ও সিকন্দর লোদীর শাসনকালেও প্রচলিত ছিল। অতএব যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলির জন্য শের শাহ প্রশংসিত হয়েছেন তার অধিকাংশই তাঁর উদ্ভাবিত নয়। পুরানো ও ভগ্নপ্রায় সুলতানি প্রশাসনিক কাঠামোকে তিনি সমকালীন প্রয়োজন মেটানোর উপযুক্ত করে তোলেন। ইস্তিয়াক হুসেন কুরেশী যথার্থই মন্তব্য করেছেন, শেরশাহের ব্যবস্থা ছিল এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের স্বাভাবিক পরিণতি। তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলির শিকর সুলতানি আমলের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই নিহিত ছিল। তিনি আরও বলেছেন, শের শাহের স্বল্পকালের শাসনে সম্পূর্ণ নতুন বা মৌলিক কোনো ব্যবস্থার উদ্ভাবন সম্ভব ছিল না। তিনি মূলত পুরানো শাসনব্যবস্থার ভেঙেপড়া দিকগুলিকেই কার্যকর করেছিলেন।

নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি নয়, পুরানো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাণসঞ্চার

ভগ্নপ্রায় সুলতানি প্রশাসনিক কাঠামোকে সমকালীন প্রয়োজন মেটানোর উপযুক্ত করে তোলা

স্বল্পকালের শাসনে নতুন উদ্ভাবন সম্ভব নয়

Scanned by CamScanner

সাধারণভাবে শের শাহ তাঁর সুলতানি কাঠামোর পুনরুজ্জীবন ও প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করলেও তাঁর প্রচেষ্টায় অভিনবত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত শাসননীতির মধ্যে। তুর্কি কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা ও আফগান স্বাতন্ত্র্যবোধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা, সামন্তশ্রেণির বাইরে বৃহত্তর প্রজাসাধারণের মঙ্গলসাধনের চিন্তা, ন্যায়বিচারের ওপর গুরুত্ব প্রদান, খলিফার সমকক্ষ উপাধি গ্রহণের মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব ঘোষণা এবং সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি প্রভৃতি তাঁর চিন্তার মৌলিকত্ব প্রমাণ করে। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার উপযোগী রাজস্বব্যবস্থা প্রচলন, যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন ও নিরাপত্তা বিধান, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বাণিজ্যের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি, মুদ্রা সংস্কার, সর্বত্র একই ধরনের ওজনের একক প্রবর্তনের প্রয়াস, সামন্ততন্ত্রের প্রভাব ও দুর্নীতিমুক্ত স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠনের প্রচেষ্টা—এ সবই ছিল অভিনব।

পুনরুজ্জীবন ও সংস্কারসাধন ছাড়াও শাসননীতিতে অভিনবত্ব

ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন একজন প্রশাসক হিসাবে মোগল বাদশাহ আকবর নানা দিক থেকে শের শাহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তৈমুর বংশের এক বিরল সৌভাগ্য ছিল যে দক্ষ প্রশাসক হিসাবে শের শাহ তাঁর অজ্ঞাতসারে মোগলদের জন্য এক প্রশাসনিক কাঠামো রেখে যান যা তারা সম্পূর্ণ নিজেরা গঠন করতে সক্ষম হত না। শের শাহকৃত প্রশাসনিক নীতি ও পরিকাঠামো সবসময়েই আকবরের সামনে এক আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করেছে। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে সামরিক সংস্কার, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সব ক্ষেত্রে আকবর শের শাহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে শের শাহ হয়ত আকবরের পালের হাওয়া কেড়ে নিতেন। এই মন্তব্যটি বিচার করলে শের শাহের কৃতিত্ব উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। শাসক হিসাবে আকবর তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেলেও শের শাহের থেকে তাঁর কাজটি সহজতর ছিল। শের শাহকে প্রায় শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছিল। ভেঙেপড়া সুলতানি প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমকালীন প্রয়োজন অনুসারে তিনি নবকলেবরে ভূষিত করেন। আফগান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রথার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকলেও সেগুলিতে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন সাধন না করে ভারতের মতো দেশে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, এ উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। সেইজন্য তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। অপরদিকে আকবরের সামনে এই প্রশাসনিক মডেলটি ছিলই। তিনি একে পূর্ণতা দান করে অনেক পরিশীলিত রূপ দেন।

প্রশাসক হিসাবে শের শাহ কি আকবরের পূর্বসূরি

শের শাহের প্রশাসনিক নীতি ও পরিকাঠামো আকবরের সামনে আলোকবর্তিকা

শের শাহের মডেলকে আকবর পূর্ণ ও পরিশীলিত রূপ দেন

শের শাহকে আকবরের পথপ্রদর্শক হিসাবে মেনে নিলেও এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে আকবরের নীতি ও ব্যবস্থাগুলি অনেক উন্নত, প্রাণবন্ত ও স্থায়ী। তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সৃজনশীলতার ছাপ স্পষ্ট। তাঁর ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি শের শাহের চেয়ে অনেক সক্রিয় ও কার্যকরী। আকবরের মতো উদার মন ও সংস্কৃতি-মনস্কতা শের শাহের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। শের শাহ যা করেছেন তা প্রয়োজনের তাগিদে। এই তাগিদ আকবরের থাকলেও তাঁর কার্যাবলির পেছনে মহত্তর বিশ্বাস ও প্রেরণা কাজ করেছিল। সেইসঙ্গে অবশ্য এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, যেখানে আকবরের রাজত্বকাল উনপঞ্চাশ বছরের, শের শাহের সিংহাসনে অধিষ্ঠানকাল মাত্র পাঁচ বছর।

আকবরের নীতি ও ব্যবস্থা শের শাহের চেয়ে উন্নতমানের

শের শাহ করেছেন প্রয়োজনের তাগিদে, আকবরের পেছনে মহত্তর প্রেরণা কাজ করেছে

Scanned by CamScanner